“কেমনে পশিল রবির কর”

মো: আলী আজম

“হে মোর চিত্ত হৃদয় তীর্থে জাগোরে ধীরে” নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অবলম্বন করে বাঙ্গালী বুদ্ধিবৃত্তির আত্ম উপলব্ধি এবং আত্ম উন্মেষের এই মহামন্ত্রে সিক্ত হয়ে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পাড়ের মানুষ যেদিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছে ‘মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে’ সেদিনই সে বুঝতে শিখেছে এই বাংলাদেশই বিশ্বময়ী এবং এখানেই ‘বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা’। বোধ-বিশ্বাসের এই জমিনে দাঁড়িয়ে নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম মানুষের কাতারে উন্নীত করতেই তার প্রয়োজন পড়লো- “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি” আবেগী উচ্চারণ এবং হাতে-কলমে তার প্রমাণ দেয়ার জন্যে “যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বোনা, মা” বজ্র শপথ। এতদঞ্চলের ইতিহাসের মোড়ে এভাবে রবীন্দ্রনাথ আত্মসচেতন বাঙ্গালীর চেতনার প্রতীক,বিকাশের অবলম্বন এবং উঠে দাঁড়াবার সাহস।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেতনায় আলোকিত, নৈতিক মানদন্ডে উত্তীর্ণ আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তা-চেতনায় রবীন্দ্র উপযোগ অফুরান। উপযোগ বলতে বৈষয়িক ব্যবহারিক মূল্য তথা ভাঙ্গিয়ে খাওয়ার বিষয় নয় বরং চলমান সময়ের আনন্দ উচ্ছাসে উচ্ছলতা,শোকে-দু:খে নির্ভরতা, সংশয়ে ধ্রুবতারা, অস্তিত্বের সঙ্কটে প্রতিরোধ সঞ্জিবনী আর আত্মিক অনুসন্ধিৎসা,অস্থিরতায় স্বস্থির পথ নির্দেশিকা হিরন্ময় জ্যোতি। বাঙ্গালীর সাফল্যে,অর্জনে রবীন্দ্র পৌরুষ আর বাংলার রূপ-লাবণ্য,গৌরব গাঁথায় রবীন্দ্র সাহিত্য মহাকালের শিলালিপি। তাই যখন যারাই এই বাঙ্গালীকে ঠকাতে এবং ঠেকাতে চেয়েছে প্রথম আঘাতটা হেনেছে রবীন্দ্রনাথের উপর। এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাঙ্গালীও রুখে দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে, রবীন্দ্রনাথকেই অবলম্বন করে।

পূর্ব বাংলায় দ্বি-জাতি তত্বের অচলায়তন ভেঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির জাগরনের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন তোমার আমার ঠিকানা অনুসন্ধান করছেন, মিছিলের মুখে প্রশ্ন করছেন- তুমি কে আমি কে, তখনও রবীন্দ্র বীক্ষণের বয়স আমার নয়। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব কিংবা কবিগুরু সম্বোধনের অধিকার তাৎপর্য্যও বুঝিনা। বিশ্বকবি বলতে বুঝি বড় কবি। কতো বড়, কেন বড় তা বুঝার কোন গরজ নেই।

একটু আগে ভাগেই পড়ার নেশায় পেয়েছিল তবে যে বয়সে,যে উদ্দেশ্যে এবং যে ভাবে বই পড়া শুরু তাতে সাহিত্য কিংবা সাহিত্যিক বিশেষের প্রতি বাড়তি খাতিরের কোন কারণ ছিলনা। তদুপরি চেয়ে-চিন্তে কিংবা ততোধিক অধ:পতিত যে উপায়ে বই জোগাড় হতো তাতে অনুরূপ খাতির দেখানোর অবকাশও ছিলনা। সহপাঠীদের ঠেক্কা দিতে, পড়ার জন্যে পড়া কিংবা খাণিক আনন্দ তথা একমাত্র বিনোদনের নিখরচা আয়োজন করতে গেলে ওসব বাদ-বিচারের বালাই থাকেনা। এভাবে পাঠাভ্যাসের শুরু হলে এক পর্য্যায়ে যে রুচিবোধ গড়ে উঠে তার অনেকটা জুড়ে থাকে লোক দেখানোর প্রবণতা বালখিল্যতা। সময়প্রবাহে এই প্রবণতার অন্ত:স্রোতে যে ভাল লাগার গোড়া পত্তন তা মূলস্রোতে পরিণত হতে সময় লেগে যায় ঢের। বলাবাহুল্য বয়ে চলা সময়ের সাথে আবর্জনাবৎ ভেসে যায় কৈশোরের চপল প্রণোদনা, বাঁকে বাঁকে রেখে যায় বিন্দু বিন্দু ভালো লাগার পলিতে গড়া অনুপম দ্বীপ। জটিল জীবনের সুক্ষাতিসুক্ষ বিচিত্র অনুভূতি চিত্রায়নে যে পাঠ একদা বিনোদনের খোরাক, ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত,আনন্দ-বেদনায় তা-ই হয়ে উঠে কখনও পথ নির্দেশক, কখনওবা বেদনা নাশক আর সারাক্ষণই নীরবে নিভৃতে হৃদয়ের সুর। সব মিলিয়ে “ দু:খের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামলো” ধরনের অনুভব।

‘আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই’র ঘোরের মধ্যেই নুতন পাঠ্যবই, দুই মলাটের মাঝখানে “আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে , বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে”। কোন দেশের কোন সে নদী নাম ঠিকানা লেখা নেই। রূপকথার গল্প যেমন শুরু হয় অনেক অনেক দিন আগের কথা , এক দেশে ছিল এক রাজা- এই মুখবন্ধ দিয়ে, ঠিক তেমনি। কত দিন আগের কথা , কোন দেশে ছিলেন কোন রাজা এসব জানাটা সাধারন কিশোর মনের জন্যে জরুরী বিষয় নয়। কোন পঞ্জিকাতেই ধরা যায়না তেমনি এক সময় বিহীন সময়, অস্তিত্ববিহীন রাজা-রানী, রাজ্যপাঠ যেমন গল্পের আকর্ষণে বাস্তব সপ্রতিভ অস্তিত্ব হয়ে উদ্ভাসিত হয় তেমনি আমাদের ছোট নদীও তার সব রূপ-ছন্দ নিয়ে হালদা,শঙ্খ,কর্ণফুলী, ইছামতি,মালঞ্চ হয়ে উঠে মুহূর্তেই। নদী মাতৃক বাংলাদেশের বাঙ্গালী যে যার মতো ভাললাগা নদীটাকে বেছে নিতে পারে নির্দ্বিধায়, নেয়ও । ভূ-গোলের অজানায় ইরাবতী,মেকং, তাইগ্রীস কিংবা ওব, ইনিসি, লেনাও কল্পনায় চক্ষুষ্মান হতে বাধা থাকেনা। জাগতিক সুখ দু:খ কিংবা কোন জটিল জীবন দর্শনের ছায়া নেই, থাকাটা জরুরীও নয়, শুধুই ছবি- ‘তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাহিবার কালে, গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে’ । আরেকটু এগিয়ে বৈশাখ পেরিয়ে ‘আষাঢে বাদল নামে নদী ভর ভর, মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর’। তারপর বর্ষার উৎসবে পাড়া মেতে উঠার ঘোষনা দিয়ে আমাদের ছোট নদীতে ঋতু বৈচিত্র্যে

বাংলাদেশের অপরূপ শোভার ঢেউ দিয়ে সোনার তরী ভাসান , তখনও আমাদের অচেনা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এভাবে প্রাইমারী স্কুলের হতদরিদ্র সেকেন্ড মাস্টারের হেঁড়ে গলায় গলা মিলিয়ে একদিন আমাদেরও- পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ী।

হাইস্কুলের রাসভারী হেড মাস্টার সে সময়কার আর সব স্কুলের হেড মাস্টারের মতোই ক্লাসের ঘন্টা পড়ার সাথে সাথে সব শ্রেণী কক্ষের সামনে দিয়ে সবেত টহল দিতেন। কদাচিৎ কোন শ্রেণী শিক্ষকের অনুপস্থিতি ঘটলে, বিশেষত: উচ্চতর শ্রেণীতে তিনি ইংরেজীর পাঠ দিতেন । ছাত্রদের খুব যে প্রিয় ছিলেন তা নয়, তবে কী এক যাদু-মন্ত্র বলে ছাত্রতো বটেই ছাত্রের গার্জেনদেরও ভয়-ভক্তি দুটোই আদায় করে নিতেন অবলীলায়। এ'যেন তাঁর জন্মগত অধিকার। সেই হেড স্যারেরই বিদায় অনুষ্ঠান, চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে পিন পতন নীরবতায় ধরা গলায় বলে গেলেন,- 'এবার আমারে লহ করুনা করে, ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই ছোট সে তরী'। সংসারে হাসির চেয়ে কান্নাটা বেশী রকমের সংক্রামক। কে কোন নদী কূলে কী লয়ে বসে ছিলেন জানা নেই। ভরা পালে কে চলে যায়, এবার আমারে লহ করুনা করে' এই আকুতিই বা কার কাছে জানা হয়না।

শুধু এইটুকু আবছা বুঝা যায়- কর্মজীবন ছেড়ে হেড স্যার যেতে চাননা, স্কুল কর্তৃপক্ষও তাঁকে ছাড়তে চায়না অথচ কী এক অমোঘ নিয়মে তাঁকে যেতেই হবে । মহাকাল সোনার তরী শুধু তাঁর ফলানো ফসল নিয়েই চলে যাবে, তিনি পড়ে থাকবেন শুন্য নদীর তীরে। জীবন দেবতা দুরে থাকুন, যাঁর বাণী ধার করে হেড স্যার কাঁদলেন এবং উপস্থিত সবাইকে কাঁদালেন তখনও তাঁর সাথে অন্তত: আমার সম্যক পরিচয় হয়নি। বলতে কি তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধিও সে সময় অনুভূত হয়নি। গল্পগুচ্ছের পোস্টমাস্টার দাদাবাবুর সামনে মুহূর্তেই যে বালিকা রতন জননীর পদ অধিকার করিয়া বসে, যে অপত্য স্নেহ পাষান কাবুলিওয়ালার রহমত নামকে সার্থক করে, অবশেষে ছুটি পাওয়া যে ফটিক স্টিমারের খালাসীর অনুকরনে 'এক বাঁও মেলেনা' প্রলাপ বকে এদের সাথে, এমনকি বোবা সুভাষিনী আর ছিপওয়ালা আলতাবের ভাব বিনিময়ের ভাষাও ম্যট্রিকের খাতায় আঁচড় কাটার প্রয়োজনের চাইতে বেশী উপাদেয় মনে হয়না। সময়ের চিত্ত চাঞ্চল্যই হবে হয়তো।

বিত্তহীন নিন্মবিত্ত পরিবার থেকে কলেজে পড়তে যাওয়ার মত আদেখলাপনা দ্বিতীয়টি নেই। পৃথিবী একদিকে তার সব চাকচিক্য নিয়ে লোভ দেখাবে আবার অন্যদিকে চোখ রাঙিয়ে জানিয়ে দেবে "বিত্ত বিচারে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত"। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রণজিত চক্রবতীর ক্লাশ সেই সীমারেখার বাইরে। অতএব, অনধিকার প্রবেশও সাদরে উৎস্যাহিত। শ্রী চক্রবর্তী তন্ময় হয়ে 'জন ডান' পড়াতে গিয়ে ঢুকে গেলেন ভানু সিংহের পদাবলীতে। এবং এক পর্য্যায়ে অবশ্যাম্ভাবীরূপে 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'। রনজিত বাবু সাধু-সজ্জন মানুষ , বানপ্রস্থের বয়স কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা তো পথ বেধে দেয়া বন্ধনহীন গ্রন্থিতে আটকা পড়ে চলতি হাওয়ার পন্থী হওয়ার অপেক্ষায়। তা সত্ত্বেও ডোন্ট কেয়ার ফার্স্ট ইয়ারের ফোর্থ পিরিয়ডের বাক বাকুম সেদিন কবরের নিস্ত ব্দতায় হারিয়ে গেল! সংসারের ধার-দেনায় জর্জরিত কত মানুষ কতোভাবেইতো রোজ আত্মঘাতী হয়, সর্বসান্ত জীবনের শেষ ছায়াটুকু মরনে লীন হয়ে যায় কিন্তু কোন ঐশ্বর্য্যবলে, কার এতো সাধ যে পরমানন্দে মরনকে জীবনে আহ্বান করে?

'দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে' অর্থনীতির জটিল তত্ত্ব আপাতত: তুলে রেখে এবার খোঁজ নেয়ার পালা- কেমনতরো, কতো মাপের কবি রবীন্দ্রনাথ? শুধু কবি? 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদের লোক' । আমাদের লোক হতে গেলে যে আটপৌরে জীবনের কাদামাটিতেও হাত দিতে হয়। বাড়াতেও হয়।

গ্রামীন ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋন ব্যবস্থার সাফল্যে কর্পোরেট বিশ্বের নজর কাড়ে বাংলাদেশ। ক্রমবর্ধমান অনুবাদে রবীন্দ্র মানস অনুসন্ধান এবং লালন চর্চার মধ্যেও আকর্ষণ দৃশ্যমান। ভোগবাদী সমাজের আত্মার গভীরে ক্ষীন হলেও, শোনা যাচ্ছে- "আমি কোথায় পাবো তারে " জীবন জিজ্ঞাসা। পশ্চিমা সভ্যতার উৎকট রূপ নিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত,শঙ্কিত হয়েও রবীন্দ্রনাথ এই বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেছিলেন যে, "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ"। দারিদ্র্য খেদানোর যুদ্ধে সেই অভয়মন্ত্র ভরসা করেই যেন গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ড: ইউনুস ঘোষনা দিলেন ঋন পাওয়ার অধিকারও মানুষের জন্মগত অধিকার। "কৃষানের জীবনের শরীক যে জন, কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি" শুধু বাণীর লাগি কান পেতেই ক্ষান্ত হননি রবীন্দ্রনাথ, পারিবারিক ব্যাংক ব্যবসা ইউনিয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে সুত্রপাত ঘটিয়েছিলেন ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের। কালে কালে সেই ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আজকের গ্রামীণ ব্যাংক প্রমান করলো আর্থিক সামর্থ্যে যে মানুষ যত ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধে তার সততা, আন্তরিকতাও তত তর্কাতীত। গ্রামীন ব্যাংক নোবেল পেয়েছে। পেয়েছেন ড: ইউনুসও। প্রাকৃতিক আর রাজনৈতিক দুর্যোগের বাংলাদেশও বিশ্বের সমীহ কাড়ে। প্রেক্ষাপটে "তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি, তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারই খ্যাতি" ঐকতান'র আশীর্বাণী মনে না পড়ে যায়না।

পশ্চিমের অতৃপ্ত আত্মার মত বাঙ্গালীও আজ "খাঁচার ভিতর অচিন পাখী"র কম তত্ব তালাশ করেনা। জাত-পাতের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত সমাজে পথে ঘাটে লাঞ্ছিত বাউলের দুর্দশা,বাউলিয়ানার ছি: ছিক্কার যখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার সেও পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায় 'পিরালি'র দায়ে ব্রাত্য ঠাকুরদের ভালবাসায়। এই একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মের হাত ধরে পল্লী,বাউল সাহিত্য ভদ্রলোকের আসরে আসন পায়, উঠে আসে বিশ্ব সভায়। সেদিন ঠাকুর বাড়ীর কল্যাণে বাউল সম্রাট লালনের প্রতিকৃতিটা আঁকা না হলে পরবর্তীতে তার জাত-পাতের বেইজ্জতি গবেষনার মত অবয়ব নিয়েও যে কি কান্ড ঘটতে পারতো তা কষ্টকল্প নয় মোটেও। বাউল সঙ্গীত ও সাহিত্যকে নাগরিক পাদপ্রদীপের আলোয় এনেই ক্ষান্ত নন রবীন্দ্রনাথ, স্বভাব বাউলিয়ানার সাথে হৃদয়েও ধারন করেন জীবন জিজ্ঞাসার একই সুর।

জাত বাউলের সাথে তাঁর তফাৎ শুধু এই 'কোন গোপন বাঁশীর কান্না হাসির গোপন কথা শুনিবারে কান পেতে' থাকলেও মুলত: তাঁর 'প্রাণের মানুষ প্রানে'ই থাকেন এবং তাকে তিনি 'সকল খানে'ই দেখতে পান। রবীন্দ্রনাথের কথায় অন্যরকম ব্যঞ্জনা না পেলে আজকের বাউল ফিউশনের নামে উন্মাতাল সময়েও গগন হরকরাকে খুঁজে পাওয়ার কোন কারন ছিলনা। বিখ্যাত ইংরেজ পন্ডিত,প্রাচ্যবিদ ম্যাক্সমুলার যেমন বাংলা শিখেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে তেমনি বাংলার বাউল বৈরাগীরাও রবীন্দ্রনাথের ডাক শুনেছেন, "শান্ত সন্ধ্যা,স্তব্দ কোলাহল। নিভাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে, চলো ধীরে, ঘরে ফিরে যাই" এবং তাতেই অমরত্বের বর পেয়েছেন। ম্যাক্সমুলার মদমত্ত ইউরোপীয় জাতির সামনে তুলে ধরেছেন বেদান্তের দর্শন আর লালনের একতারার ঠুং ঠাং আজো ঝংকার তুলছে অতৃপ্ত বিশ্ববাসীর আত্মায়। নাবালক আত্মীয়দের পক্ষে জমিদারীর হিস্যা তত্বাবধান করতে সাজাদপুর এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই যাত্রায় জমিদারীর তত্বাবধান তো করেইছেন, একইসাথে জাতে তুলেছেন ভাটি বাংলার প্রাণের সুর বাউল সঙ্গীতকে,অমরত্ব দান করেছেন বাংলা সাহিত্যকে বিশেষত: ছোট গল্প ও কবিতায়।

ময়মনসিংহের অঞ্চল ভেদে আকারে প্রকারে উচ্চ ফলনশীল "লাফা" বেগুনের লাফালাফি দেখে চকিতে মনে পড়ে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকা থেকে উচ্চফলনশীল আলফা আলফা বেগুনের বীজ আনার তাগিদ দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারের সাথে তাঁর সখ্যতাও সবার জানা কথা। গুণীদের গবেষনায় দেখা যায়, আজকের সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ খামার মিল্ক ভিটার প্রেক্ষাপট রচনায়ও তাঁর অবদান। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর কবিখ্যাতি। কেমন সে খ্যাতি?

বিশেষায়নের যুগে বাংলা বাজারে শিল্প-সাহিত্য,কাব্য-কলা কীর্তি এবং তার স্রষ্টাদের সৃজনশীল সময়,বিষয়বস্তু এবং গুনাগুন বিচারে সীমাবদ্ধতার মার্কা মেরে দেয়া এক রকমের প্রতিষ্ঠিত রেয়াজ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। কবি-সাহিত্যিকদের মুল্যায়নে বিশেষায়নের নামে এই ভেদ বিচার আরও কড়া পাকের সামগ্রী। সময় বিচারে দশক-শতক, অগ্রজ-অনুজ , তাঁদের স্বচ্ছন্দ বিচরন ক্ষেত্র তথা বিষয় বস্তু বিচারে পল্লী কবি, নাগরিক কবি, প্রেমের কবি, দ্রোহের কবি, বিপ্লবী কবি- এভাবে মার্কা মারার পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা যায় এই বিশেষ কবির কাব্য চর্চায় বিশেষ একটা সময় তার সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত,অনুসঙ্গ নিয়ে ফুটে উঠে এবং অথবা এই সময়ের অনেকের মধ্যে তিনি সেরা কিংবা সব বিষয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনার বহি:প্রকাশ ভাল তবে এই বিশেষ বিষয়ে তা আরও বেশী ভাল।

বলাবাহুল্য স্ব-সমাজের চাহিদা এবং নিজের সামর্থ্য মোতাবেক আবেগের তাড়নায় মানুষ সীমিত সময়কালে তার মেধা-মনন দিয়ে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষত্ব অর্জন করেন। এভাবে বিশেষায়নের নামে অখন্ডকে খন্ডিতরূপে দেখা কিংবা অনেকের সাথে ভাগাভাগি করে দেখার যত সুফলই থাকুকনা কেন তা মোটের উপর, ব্যক্তির সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাই প্রমান করে। কিন্তু কালে কালে এমন মানুষও কি জন্মাননা যাঁরা সমগ্রকে সমগ্ররূপে-ভাবে দেখতে এবং তা অন্যের সামনে পরিপুর্ণরূপে তুলে ধরতে সক্ষম? বিশ্ব ব্রহ্মান্ডব্যাপী জীব ও জড়ের এক জনমে হাজার জনমের অনুভূতি, নিখিলের নিয়ত পরিবর্তনশীল অথচ প্রতি পল,অনুপলে বিশিষ্ট বিচিত্র রূপ কোন পুরুষোত্তমের হাতে বিমুর্ত হয়ে উঠেনা কি? ঋতুচক্রের আবর্তনে চির পুরাতন এই বিপুল বিশ্ব নিত্য নুতন রূপ-রস নিয়ে যেখানে ধরা দেয় , যেখানে মহাকালব্যাপী জীবনের পরতে পরতে বিচিত্র অনুভব-উপলব্ধি অবলীলায় দোল খেয়ে যায় তার নাম রবীন্দ্র মানস। এখানে দেশ-মহাদেশের কৃষ্টি-সভ্যতা,শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার বৈচিত্র নিয়ে ধরনী সামগ্রীকতায় সম্পুর্ণ। এখানে সুখ-দু:খ,চাওয়া-পাওয়া ইত্যাকার নিজস্ব অনুভব অনুসন্ধিৎসা নিয়ে শৈশব-কৈশোর,যৌবন-জরার প্রতিটি অধ্যায় যেমন স্বকীয়তায় বৈশিষ্ঠ্যময় তেমনি এসব স্তর বিন্যাসে সমন্বিত জীবনও এক একটি ফুল দিয়ে গাঁথা সম্পুর্ণ মালার মত। যৌবন যেমন তেমনি জরাও জীবনের অবিচ্ছেধ্য অংশ।

সুখ-দু:খও তেমনি। সমস্ত আনুকুল্য , সমস্ত বৈপরীত্য সব মিলিয়েই মহাকালব্যাপী যে জীবনের আয়োজন তা-ই মুর্ত হয়ে উঠে রবীন্দ্র ভাবনায়। শুধু কবিতা কেন, কলাবিদ্যার কোন শাখায় রবীন্দ্র উৎকর্ষতার ঘাটতি পড়েছে কি?

চিত্রায়নে বাদ কি পড়েছে মানব জীবনের কোন অধ্যায় কিংবা ত্যাগী-ভোগী,গৃহী-সন্ন্যাসী নির্বিশেষে জীবনের কোন আকৃতি, কোন জিজ্ঞাসা? সহজ থেকে জটিল উত্তর কিংবা একেবারেই উত্তর বিহীন- কালের এমন কোন প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে কি রবীন্দ্র লেখনী, কর্ম ও সমাজ চিন্তা? তারপরেও কবির বিনীত আক্ষেপ- 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!' কিংবা ' দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে দুই চরন ফেলিয়া একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু'।

বিনীত অতৃপ্তি- "আমার কবিতা, জানি আমি , গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী"। হৃদয়ে তাঁর নিরন্তর অনুরণন- " ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে- হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা ,অন্য কোন্খানে"। পুর্নতার রথযাত্রায় সৃষ্টিশীলতার প্রাথমিক শর্ত এই অকিঞ্চিৎ,অসম্পুর্ণতার অনুভব এবং তা নিরসনে নিরন্তর ছুটে চলার সাধনা কোন পুরুষোত্তমকে নিয়ে যায় দেশ-কালের সীমানার বাইরে, স্থাপন করে অনন্ত জীবনের স্রোতে অনন্য অবয়বে। এভাবে সৃষ্টিশীল চিন্তা-কর্মে দেশ-কালের উর্ধ্বে এমনকি নিজেকেও ছাড়িয়ে যাওয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর , বাংলার গৌরব। শুধু কি বাঙ্গালীর এবং বাংলার? একক ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভাবনার এতো ব্যাপকতা, দর্শনের গভীরতা, সৃষ্টির নান্দনিকতা এবং সর্বোপরি কর্মের মহাযজ্ঞে এমন কোন কবি-স্যাহিত্যিক-দার্শণিক-সংস্কারককে পৃথিবী কি এযাবৎ দেখতে পেয়েছে? এর উত্তর নঞার্থক বলেই রবীন্দ্রনাথকে কোন বিশেষ অভিধায়,সীমিত ঔজ্বল্যে উপলব্ধি করা যায়না,ধরা যায়না। এমনকি সাহিত্যে বিশ্বসেরা নোবেল পুরস্কারেও না।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিধি বেড়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা চেতনার উৎকর্ষে নোবেল পাওয়া, এবং না পাওয়া কীর্তিমানের সংখ্যাও পৃথিবীতে অসংখ্য। তাদের মধ্য থেকে,অভাজনের নিতান্ত সাধারণ জীবন চর্চায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথে পক্ষপাত কেন? রুটি-রুজির সন্ধানে ঘর ছেড়ে আসার সময় কন্যাটি "ধরিলনা বাহুপাশ রুধিলনা দ্বার, নতমুখে উচ্চারিল শুধু স্নেহ অধিকার , যেতে আমি দেবনা তোমায়।" স্বর্গ্য-মর্ত্যব্যাপী সেই গভীর ক্রন্দনের ভেতরে থেকেও আবার স্যামাজিক সাংসারিক দায় মেটাতে গলদঘর্ম সারাক্ষণ ঠের পাই "সংসার এদিকে সাঁকো নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলি পার করিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবেনা।" সকাল-সন্ধ্যা এ বৈপরীত্য নিয়ে পথ চলাতে জীবনের কাছে যতই আশ্রয় খুঁজি মহাকাল জানিয়ে দেয় "যে আশ্রয় যত জীর্ন তাহা যত জোরের সাথে আঁকড়ে ধরা হয় তাহা তত জোরের সাথেই ভাঙ্গিতে থাকে"। অনিবার্য্য একাকীত্বে পথ চলতে গিয়ে দেখি 'এ গলিটা ঘোর মিছে' জীবনে জীবন যোগ করার তাগিদ নিয়ে কাছেই আছেন কেউ। সোনার তরী, বলাকা, গল্পগুচ্ছ কিংবা অখন্ড গীতবিতান এক জীবনে আর কতো জীবনের যোগ চাই?